# শিক্ষাবিদ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

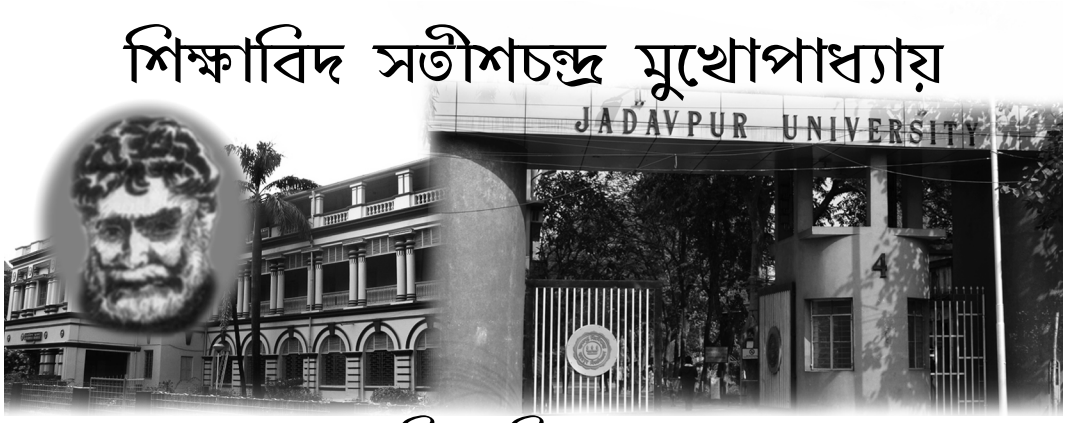


## প্রব্রাজিকা বিদ্যাত্মপ্রাণা

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইতিহাসের পাতায় প্রায় বিস্মৃত একটি নাম। স্বাধীনতার আগে অখণ্ড বাংলায় যে-সমস্ত স্বদেশিভাবাত্মক দলগুলি গড়ে উঠেছিল, সেগুলির অন্যতম 'ডন সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠাতারূপেই তিনি বেশি পরিচিত। কিন্তু এর থেকেও বড় একটি পরিচয় তাঁর আছে—তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন শিক্ষাবিদ। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তা-ই আজ বহু পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে—একথা আমরা কজনই বা জানি?

সতীশচন্দ্রের জন্ম হুগলির বন্দিপুর গ্রামে, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন। পিতা কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়। পড়াশোনা সাউথ সুবার্বান স্কুলে। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) এফ এ পড়ার সময় ভালভাবে অঙ্ক শেখার জন্য সতীশচন্দ্র নিয়মিতভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজের এক অধ্যাপকের ক্লাসে যেতেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এইভাবেই। মেট্রোপলিটন থেকে এফ এ পাশ করে সতীশচন্দ্র সরকারি বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন এবং তারপর ইংরেজিতে এম এ করেন। এরপর তিনি প্রথমে মেট্রোপলিটনে এবং পরে বহরমপুর কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। কিন্তু পরাধীন ভারতে প্রচলিত ইংরেজদের শিক্ষানীতিকে এই দেশভক্ত যুবক কোনওদিনই মেনে নিতে পারেননি। ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলের একটি লেখায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শিক্ষানীতি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

"I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief, such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such calibre, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and, therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem,

their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation."

বিদেশিভাবাপন্ন, মৌলিকচিন্তাবিহীন কেরানি তৈরির ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় বীতস্পৃহ হয়ে সতীশচন্দ্র বি এল পরীক্ষা দেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে শুরু করেন। কিন্তু শিক্ষকতাই যাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর পক্ষে বেশিদিন একমনে ওকালতি করা সম্ভব হল না। ছাত্ররা যাতে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়তে পারে, তার জন্য এবার তিনি নিজেই উদ্যোগী হলেন এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে সন্ধেবেলায় একটি শিক্ষাবিভাগ শুরু করলেন। এর নাম ছিল 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে দেশের যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল এই চতুষ্পাঠীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

একই সময়ে সতীশচন্দ্র 'ডন পত্রিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এতে ভারতের ধর্ম ও ঐতিহ্যমূলক বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ থাকত। সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের পাশাপাশি ছাত্ররাও এই পত্রিকায় তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেন। ক্রমে পত্রিকাটি সেসময়ের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রকাশের এক সার্থক ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ যখন বাংলায় একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, অথচ নানা কারণবশত তাঁর সেই ইচ্ছা কিছুতেই বাস্তবায়িত হচ্ছিল না, সেসময়ে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে বোঝা যায় যে তিনি ডন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৯৮-এর মার্চে বেলুড় মঠ থেকে গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী ডন পত্রিকার প্রচারের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছেন—"ডন কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০ টাকা খরচ হইবে, এবং দুইশত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারিবে, ইহা মস্ত খবর।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দ, যিনি পরবর্তী কালে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন, তিনি পূর্বজীবনে ডন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

ডন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল আদর্শবাদী, দেশপ্রাণ, উৎসাহী যুবক একত্রিত হন এবং এরই ফলস্বরূপ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে ডন সোসাইটি। এঁদের মধ্যে বিনয়কুমার সরকার (পরবর্তী কালে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী) কিশোরীমোহন গুপ্ত, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (পরে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি) প্রমুখ ছিলেন সোসাইটির সক্রিয় সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক। দেশীয় ভাবধারায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে দেশবাসীর লুপ্ত আত্মগৌরব ফিরিয়ে এনে তাদের আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত করে তোলাই ছিল ডন সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চিকিৎসক নীলরতন সরকার প্রমুখ সেসময়ের দিকপাল মনীষিবৃন্দ ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে আমন্ত্রিত হতেন। সোসাইটির ছাত্ররা এইসব বক্তৃতার নোট্স নিত এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিষয়টি সম্বন্ধে নিজেদের চিন্তাভাবনা লিখে শিক্ষকদের কাছে জমা দিত। এভাবেই তাদের মধ্যে উচ্চ ভাবগুলি জেগে উঠত

এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা গড়ে উঠত—আজকের নোট-নির্ভর কোচিং ব্যবস্থায় যা কিনা ক্রমশই বিরল হয়ে পড়ছে।

ডন সোসাইটির শিক্ষাব্যবস্থায় একটি প্রযুক্তি বিভাগও ছিল, যেখানে ছাত্ররা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালানো, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁত বোনা, সাবান-তেল প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করা ইত্যাদি বিভিন্নরকম প্রযুক্তিগত শিক্ষা পেত। এ-বিষয়ে ডন সোসাইটিই ছিল পথিকৃৎ। ছাত্রদের হাতে তৈরি জিনিস বড়বাজারের একটি স্বদেশি দোকানে বিক্রি করা হত—এতে যেমন কাজের গুণগত মান বাড়ত, তেমনি ছাত্ররা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার সুযোগ পেত।

ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনা যতই বাড়তে লাগল, ততই দেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল ইংরেজ সরকার। এরই উপায়স্বরূপ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার পাশ করল 'Universities Act', যার দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটিতে আরও বেশি সংখ্যক ইংরেজ সদস্য নিয়োগ করা হল। একইসঙ্গে শুধুমাত্র ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত বেশ কিছু কলেজের সরকারি স্বীকৃতি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত তো হলই না, উলটে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হল। ইংরেজদের কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে গোলদিঘির (কলেজ স্কোয়ার) পাশে অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখা হল 'গোলদিঘির গোলামখানা' এবং তার পরিবর্তে এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন।

সাল ১৯০৫। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশের বিরুদ্ধে বাংলার সর্বত্র আন্দোলন শুরু হল। ভারতীয়দের নিজস্ব একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্তকে তখনই বাস্তবায়িত করার জন্য সবাই চেষ্টা শুরু করলেন। ১৬ নভেম্বর পার্ক স্ট্রিটে 'ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' প্রায় দেড়হাজার প্রতিনিধির এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করলেন। এতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা বয়কট করার জন্য ছাত্রদের কাছে আবেদন করলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই সমাবেশেই সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম গৃহীত হয়—"... A National Council of Education (NCE) should be at once established to organize the system of education—Literary, Scientific and Technical—on National lines and under National control."

এই মহৎ উদ্দেশ্যে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক সাগ্রহে এক লক্ষ টাকা দান করেন। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এবং শিক্ষানুরাগী ড. রাসবিহারী ঘোষ NCE-র সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন এবং রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জি, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এর ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে NCE রেজিস্ট্রিভুক্ত হয় এবং ওই বছরেই ১৫ আগস্ট সম্পূর্ণরূপে কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীনে বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯/১ বউবাজার স্ট্রিটের এই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ মনোনীত হন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এবং সাম্মানিক সুপারিন্টেনডেন্ট হন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মোটামুটি একই সময়ে অপর একজন উদ্যোগী বাঙালি তারকনাথ পালিত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসারের জন্য 'সোসাইটি ফর প্রোমোশন অব টেকনিক্যাল

এডুকেশন' নামে একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্থা গড়ে তোলেন এবং এর অধীনে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই ৯২ আপার সার্কুলার রোডে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালে এই সোসাইটি NCE-র অধীনে চলে আসে এই শর্তে যে, NCE-র অর্থের অর্ধাংশ প্রযুক্তিশিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে। বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজটি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় এবং একীভূত এই দুটি কলেজের নতুন নামকরণ হয় সেন্ট্রাল ন্যাশানাল ইনস্টিটিউশন।

ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধিতায় যখন একের পর এক জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে NCE-র এই সাফল্য সত্যই প্রশংসনীয় এবং বিস্ময়কর। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতায় সেন্ট্রাল ন্যাশানাল ইনস্টিটিউশন-এর সমস্ত বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গেলেও প্রযুক্তিবিভাগে ছাত্রসংখ্যা কমেনি, বরং যুদ্ধকালীন বিভিন্ন প্রয়োজনে এখানকার ছাত্রদের কদর ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল যাদবপুরে একশো বিঘা জমি কিনে কলেজটি যাদবপুরে স্থানান্তরিত করেন এবং অবশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর, ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে এই প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। আজ সারা বিশ্বজুড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী যে খ্যাতি ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন, তার মূলে রয়েছে স্বার্থশূন্য, স্বদেশপ্রেমিক এক ব্যক্তির নিরলস প্রয়াস ও নীরব আত্মনিবেদন—ঋষি অরবিন্দ যার যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে—''Satish Chandra Mukherjee was a man who had given his life to that work that had really organized the National College in Calcutta and yet he lived a life like a Sannyasin."

গৃহস্থ জীবনযাপন করলেও অন্তরে সন্ন্যাসী এই মানুষটির ওপর কী অরবিন্দ, কী গান্ধিজী—সবারই ছিল অগাধ আস্থা। তাই দেখা যায় রাজনৈতিক কারণে বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে শ্রীঅরবিন্দের সরে আসার পর অধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন সতীশচন্দ্র। তবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনিও এক বছরের বেশি এই পদে থাকতে পারেননি। অরবিন্দ সবকিছু ছেড়ে পণ্ডিচেরিতে চলে যাওয়ার পর তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম'-এ সতীশচন্দ্র নিয়মিত লেখা দিতেন।

মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনেরও বড় সমর্থক ছিলেন সতীশচন্দ্র। ১৯২২ সালে তিনি কারারুদ্ধ হলে সতীশচন্দ্র দুমাসের জন্য সবরমতী আশ্রমে চলে যান এবং আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শোনা যায়, দীক্ষাগুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নির্দেশে সতীশচন্দ্র গান্ধিজীকে তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রতিমাসে একশো টাকা করে পাঠাতেন এবং তিনিও তা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করতেন। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পর সতীশচন্দ্র যখন মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীতে তাঁর শেষ দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন, সেসময় গান্ধিজী যখনই বারাণসীতে পদার্পণ করতেন, কিছুসময় সতীশচন্দ্রের সান্নিধ্যে কাটিয়ে যেতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকা চলে গেলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সতীশচন্দ্র স্বামীজীর গুরুভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। বলেছেন, ''পরমহংস-দেবের তিরোধানের দু-তিন বৎসর পরে আমি বরাহনগর রামকৃষ্ণ মঠে যাতায়াত আরম্ভ করি। তখন স্বামীজী পরিব্রাজক, ওখানে নেই। ওখানে

সাধুদের সঙ্গে যথাসাধ্য জল তোলা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া ও অন্যান্য কাজ করে তৃপ্তি পেতাম।"

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অভূতপূর্ব সাফল্যে গর্বিত হয়ে ১৮৯৪-এর জানুয়ারিতে সতীশচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত 'লাইট অব দি ইস্ট' নামক ইংরেজি পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। অনুমান, 'জিরো' ছদ্মনামে লিখিত প্রতিবেদনটির লেখক সতীশচন্দ্র স্বয়ং। রচনাটির কিছু অংশ এরকম—''বিবেকানন্দ-স্বামীকে আমি নিজস্বভাবে জানি। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, পবিত্রতা এবং প্রতিভা সম্বন্ধে আমার সমুচ্চ শ্রদ্ধা।...

''আমি তাঁকে ভালবাসি, কারণ তিনি সকল মানুষের ভালবাসা পাবার যোগ্য। চমৎকার দীর্ঘ প্রশস্ত পুরুষ; অপূর্ব সুন্দর মুখ যা মনস্বিতায় পূর্ণ; বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু—প্রসন্ন স্থির প্রেমে ও স্নেহে তোমার প্রতি আনত; বুদ্ধির প্রভায় ঝলমলে অবয়ব—সত্যই ভালবাসার যোগ্য মানুষ—এই বিবেকানন্দ।... তোমার প্রতি নিবদ্ধ তাঁর প্রদীপ্ত নয়নের দিকে যদি তুমি তাকাও, দেখবে, তাঁর মধ্যে আছে সঙ্কল্পশক্তির আগ্নেয়গিরি, যা ঠিক পথ গ্রহণ করলে মাতৃভূমিতে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবে।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন বিষয়ক সময়োপযোগী নানা আলোচনা, মতামত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকাটিতে।

প্রথমবার বিদেশ থেকে ফেরার পর স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সতীশচন্দ্র। তাঁর স্মৃতিতে চির-উজ্জ্বল ছিল সেই দৃশ্যটি—

''...কাশীপুরে এক বাগানবাড়িতে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর তখন অন্যমূর্তি। বাইরের দুনিয়া ফেরত জগদ্বরেণ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। একটা বৃহৎ হলঘর। একশো আন্দাজ লোক সেখানে উপস্থিত। প্রতীচ্যের ভক্তেরাও ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সকলের ধর্মালোচনা চলছিল। আমি ঢুকছি দেখেই স্বামীজী তাঁর চেয়ার ছেড়ে একেবারে দরজার গোড়ায় এসে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। হাত ধরে টেনে নিয়ে একটা কৌচে নিজের অতি কাছে বসালেন এবং সেই পূর্বকালের নরেন্দ্রনাথের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে বালকের মতো আলাপ করতে লাগলেন।...

''পরে আমার পরিচিত একটি মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় (সে ছাত্র এখন একজন প্রসিদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত জজ) স্বামীজী অম্লানবদনে হেসে বললেন, 'Is he a fanatic?' আমি বললাম, 'No'. তখন উত্তর করলেন, 'Then I have no need of him—তাকে আমার দরকার নেই।' 'ফ্যানাটিক' অর্থে তেজীয়ান যুবক—ধর্মের বা দেশের জন্য সর্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত কিনা—এইভাবে রহস্যপূর্বক শব্দটি ব্যবহার করলেন। স্বামীজী আমাকে দেশের কাজে অধিক যোগ্য হওয়ার জন্য আমেরিকা জাপান পাঠাবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু আমার অনিচ্ছায় তা সম্ভবপর হয়নি।"

দেশ ও শিক্ষার উন্নতির জন্য বলিপ্রদত্ত সতীশচন্দ্রের মধ্যে কি স্বামীজী খুঁজে পেয়েছিলেন একজন 'ফ্যানাটিক'-কে? নইলে কেনই বা তাঁর ডন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং তাঁকে আমেরিকা ও জাপানে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন? মাতৃভূমি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য সর্বস্ব দিয়েছিলেন বলেই 'ফ্যানাটিক' সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়নি, উপরন্তু যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নব নব সংযোজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধতর হয়েছে। আজ তাঁর জন্মসার্ধশতবর্ষে বড়ই প্রয়োজন তাঁরই মতো আদর্শবাদী, চিন্তাশীল, ছাত্রদরদি, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের, যাঁদের হাত ধরে দেশ ও সমাজ আবার নতুন করে গড়ে উঠবে।